শিশুপাঠ্য বই,...

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুপাঠ্য বই, কিন্তু ব্যাপারটা তো ছেলেখেলা নয়

‘শিক্ষা নাও শিক্ষা এই উন্মাদের পাঠক্রম
খুলে দিলাম আজ থেকে’
‘চিৎপটাং চিৎপটাং করছি তোর স্বাস্থ্যপান
সিদ্ধ ভাত সিদ্ধ ডাল সিদ্ধ ফল তেলছাড়া
উপড়ে আন চোখ দুখান হত্যালয় বোলতানে
গাইছি গান চিৎপটাং অন্ধ গ্রাম প্রান্তরে
কিন্তু এই ছাত্রদল ভদ্র সব ছাত্ররা---
সবাই ঠিক বুঝছে তো ?
বুঝছে না ?....’
‘এই পূর্ণ লুপ্তাকার, এই লুপ্ত পূর্ণাকার লোপ
অর্থ নেই অর্থ নেই, ঘাড়ে মারলে কোপ’
‘এই যা বললাম সব, সমস্ত প্রলাপ জ্ঞান কোরো বন্ধু....
‘না লিখো না, লিখন জ্বলে শ্যামা রক্ত জিভে তোর কী লেখা’
‘শিক্ষা ঠিক হচ্ছে তো ?’
জয় গোস্বামীর উন্মাদের পাঠক্রম থেকে নির্বাচিত

এই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাবি করে থাকেন, এক ‘নজিরবিহীন সাফল্য’ অর্জন করা গেছে। সরকারি তথ্য পরিসংখ্যান দিয়েও এ দাবি প্রমাণ করা যাবে না।১ তবে এটা ঠিক সেই ১৯৮০-র দশক থেকেইসরকার শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন এবং সংস্কারসাধনের চেষ্টা করে আসছেন। যে - ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন ছিল; যদিও বুদ্ধিজীবীমহলে তার একটা অংশ নানা যুক্তিতে সেই প্রয়াসগুলোর বিরোধিতা করেছেন। প্রথমিক স্তরে ইংরেজির দাবি নিয়ে প্রায কুড়ি বছর ধরে একটা আন্দোলনই হয়ে গেছে এ - রাজ্যে। অন্যদিকে সরকারি নীতিকে যাঁরা এক সময় সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও অনেকে সে সমর্থন ধরে রাখতে পারেননি; কারণ সরকারের প্রস্তাবিত নীতি বাস্তবে যে-চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে, তাকে নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায না। ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার যখন ‘ফাংশনাল - কমিউনিকেটিভ’ পদ্ধতির কথা বলেছিলেন,আমরা অনেকেই তা সমর্থন করেছিলাম ক ারণ এই পদ্ধতিতে শেখানোর কাজটা হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে; ব্যাকরণের কিছু সূত্র আর বাক্য গঠন রীতি মুখস্থ করিয়ে দিয়ে নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পদ্ধতি অনুসারে যে-বইতৈরি হলো, ‘লার্নিং ইংলিশ’ নামের এই পুস্তকমালাটি

হাতে নিয়ে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, তা কাজ করছে না। যে - পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিল তা-ও ঠিকমতো অনুসৃত হয়নি।

ঃঃ- এই পদ্ধতিই মান্য করে করি, কারণ ভাষা ব্যাপারটা, চমস্কি যেমন বলেছেন, নিছক অভ্যাসপ্রণালী বা 'হ্যাবিট সিস্‌টেম' নয় । হ্যালিডেরও তাই মত।

এদিকে জনমতের চাপে সরকার আবার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিকে ফিরিয়ে আনলেন; সমস্যাটা কিন্তু রয়েই গেল (দ্বিতীয়) ভাষা শেখানো হবে কী-ভাবে? শেষ খবর যা পেয়েছি তা হলো শিক্ষক - শিক্ষিকাদের ভালো করে ট্রেনিং না দিয়েই প্রথম শ্রেণিতে ইংরেজি শেখানো শু হয়ে গেছে। এটা কি একটা খুব বুদ্ধি - বিবেচনার কাজ হলো! শিক্ষাপদ্ধতিগত একটা গুত্বপূর্ণ বিষয়ের জোড়াতালি সমাধান করে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধার স্বার্থে।এর আগে 'বর্ণপরিচয়' আর 'সহজ পাঠ' নিয়ে বিতর্কের নিষ্পত্তিও করা হয়েছিল একইভাবে। একটা সময়ের পর সরকার সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন, মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কার এবং ভাবাবেগে যেন বেশি ঘা না লাগে।

ঘটনাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী? ভালো হোক, মন্দ হোক, সরকার একটা নীতি গ্রহণ করছেন। কেউ তার বিদ্ধে কোন প্রশ্ন তুললেই 'উদ্দেশ্য - প্রণোদিত' কায়েমিস্বার্থপুষ্ট' ইত্যাদি বামপন্থীদের বাঁধাবুলি দিয়ে তাকে নিন্দা করছেন; কিন্তু মাটিতে পা রেখে দৃঢ়মত হয়ে দাঁড়ানো--- ইংরেজি ইডিয়মে যাকে বলে 'পুটিং ওয়ানস ফিট ডাউন' --- সেই অবস্থানটা আর শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারছেন না। গত কুড়ি বছর ধরে এই ব্যাপারটাই ঘটছে। সরকারেরগৃহীত নীতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সাধু এবং যুক্তিযুক্ত; কিন্তু প্রয়োগ আর প্রকরণের নিরিখে বিচার করলে বলতেই হবে শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে এই সরকারের ট্রাক রেকর্ডটা মোটেই ভালো নয়।

কথা তুলছি বিশেষ করে, কারণ একইভাবে আবার একটা খামখেয়ালি কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে এ রাজ্যে। যে দুটি বিষয় নিয়ে বঙ্গের বিদ্বৎসমাজে এখন তোলপাড় চলছে তার একটি হলো বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত নতুন বানানবিধি এবং লিপিচিহ্ন বা হরফের সংস্কার। বানানের ক্ষেত্রে আকাদেমি যে অভিধান তৈরি করেছেন, তার দু-চারটি শব্দের বানান নিয়ে মতদ্বৈত থাকতে পারে; কিন্তু বানানে সমতাবিধানের প্রয়োজনীয়তাটা অস্বীকার করা যায় না। পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রছাত্রীরা যে একই শব্দের বিভিন্ন বানানের সঙ্গে পরিচিত হয়। এটা তাদের ওপর এক ধরনের নির্যাতন।তাই পাঠ্যপুস্তকে অন্তত বানানের সমতাবিধান অবশ্যকর্তব্য। হরফে স্বচ্ছতা আনার কাজটাও খুবই জরি। বাঙলা হরফের ছাঁদ বারবার বদলে এখন যে - চেহারা পেয়েছে, তার ভেতরেও অনেক উদ্ভটত্ব আছে। এই উদ্ভটত্ব বা সুকুমার রায়ের কথায় 'আজগুবি' ব্যাপারটা অবশ্য ভাষার স্বভাবধর্ম। শব্দের উচচারণের সঙ্গে তার বানানের বৈসাদশ্য সব ভাষাতেই আছে। এটার সম্পূর্ণ সমতাবিধান হয়ত কোনদিনই সম্ভব হবে না; কারণ লিপি জিনিসটাই মনগড়া বা'আরবিট্রারি'। তবু হরফে স্বচ্ছতা নিয়ে আমাদের প্রয়াসটা চালিয়ে যেতেই হবে। বস্তুত এ-কাজটা আগে থেকেই চলছে। ঝিভারতী রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও হু-কে 'হু' করে দিয়েছে; তাতে মোটেই গুদেবকে অসম্মান করা হয়নি। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এই পরিবর্তন অনুমোদন করতেন; কারণ তাঁর অন্তত ষাট বছরের সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বানান বদলেছেন একাধিকবার। রূ-র জায়গায় 'রূ', ঙ্গ-কে 'ঙ-গ' লেখা --- এসব আনন্দ পাবলিশার্সের বইতেও দেখা যায়। সেদিক থেকে আকাদেমি কিছু ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কাজ করছেন না। বিচ্ছিন্নভাবে যা চলছিল, তাকেই সূত্রবদ্ধ করে একটা সংহত রূপ দেবার এই প্রয়াস প্রশংসনীয় এবং সমর্থনযোগ্য। তবে এক্ষেত্রেও অবশ্য দু-একটি শব্দের পরিবর্তিত লিপিরূপ নিয়ে কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে; যেমন 'কৃষ্ণ'। আকাদেমির ছাঁদে ঙ্গ, ঙ্ক ইত্যাদিকে যে- রূপে প্রকাশ করা হয়, তা-ও খুব নয়নশোভন নয়। এগুলো নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে এবং আকাদেমির কাছ থেকে আমরা পুনর্বিবেচনাও প্রত্যাশা করতে পারি; কিন্তু প্রয়াসটাকে সমর্থন না করার কোন কারণ দেখি না।

দ্বিতীয় বিতর্কিত বিষয়টি হলো মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একটি নির্দেশ ষষ্ঠ এবং সপ্তম (আপাতত শুধু ষষ্ঠ) শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে

সাধু বাঙলায় লেখা গদ্যকে চলিতে রূপান্তর করে নিতে হবে। এই নির্দেশ এক কথায় উদ্ভট এবং একে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না; যদিও যে বিবেচনা থেকে এ রকম একটি রীতি প্রবর্তন করতে চাওয়া হচ্ছে, তার গুত্ব আমি একেবারেই অগ্রাহ্য করি না। নিচু ক্লাসে চলিত বাঙলার সঙ্গেই শিশুদের পরিচয় হওয়া ভালো; তাতে ভাষার চলতি ব্যবহারিক র ূপটি সহজেই রপ্ত করে নেওয়া যায়। এই যুক্তিকে ষষ্ঠ - সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে সাধু গদ্যের কোন নমুনা যদি না-ই রাখা হয়, তাহলেও বঙ্গভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হয় না; কারণ বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রমুখের রচনা পাঠ করার সুযে াগ তো তারা উচুঁ ক্লাসে পাবেই। প্রাচীন থেকে শু করে বর্তমানে আসা--- এই বিবর্তনবাদী ধারণাটাই আসলে গে ালমেলে। শেখা ব্যাপারটা কোন একমুখী প্রক্রিয়া নয় তথ্যের সঙ্গে তথ্যজুড়ে জুড়ে--- শুধু একটা 'অ্যাডিটিভ' পদ্ধতিতেও আমার শিখি না। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে তো এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য। শিশুর মুখে বেশ কঠিন এবং জটিল শব্দের উচচারণ মাঝে মাঝেই আমাদের চমকে দেয়।

নিচু ক্লাসের পাঠ্যবইয়েত সাধু গদ্যের কিছু রচনাংশও রাখা যেতে পারে, তবে অবশ্যই তা নির্বাচন করতে হবে ওই বয়সের শিশুদের গ্রহণশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এই কাজটাও কিন্তু আগে করা হয়েছে। সম্প্রতি দূরদর্শনের একটি অ ালোচনা - সভায় অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলেছেন, ১৯৫৩ সালে 'কিশলয়' বইতে নাকি বিদ্যাসাগরের রচনা চলিতে র ূপান্তর করে ছাপা হয়েছিল। ১৯৫৩-র 'কিশালয়' আমার হাতের কাছে নেই; ফলে তথ্যটি ঠিককিনা যাচাই করতে প ারছি না। তবে ১৯৬৩ সালে চতুর্থ শ্রেণিতে আমি যে কিশলয় পড়েছি, সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'কৃষিকর্ম' নামে একটি রচনা আমাদের পাঠ করতে হতো। বিদ্যাসাগরি বাঙলায় লেখা এই রচনাংশটি এমনভাবে নির্বচন করা হয়েছিল যে, আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি।

আমার এই অভিজ্ঞতাটাই অবশ্য চূড়ান্ত বিচারমান হতে পারে না। সরকারি নথিপত্রে যতটা দাবি করা হয়, ততটা না হলেও প্রাথমিক শিক্ষায় আজ পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিঃসন্দেহে অনেক বেড়েছে। এমন বহু পরিবার থেকে আজ শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে, যে পরিবারে আগে বিদ্যাচর্চার কোন অভ্যাসই ছিল না। প্রথম প্রজন্মের এই শিক্ষার্থীদের কথা আমাদের বিবেচনা করতেই হবে এবং জনশিক্ষার স্বার্থেই পাঠ্যবইগুলির ভাষা এবং পাঠ্যবিষয়ে পরিবর্তন আনা দরকার। কিন্তু এটা করতে গিয়ে বাঙলা গদ্যের একটি বিশেষ রীতি বা কোড-কে আমরা বিকৃত করতে পারি না। এর দ্বারা শুধু যে ওই লেখকদের প্রতি অবিচার করা হয় তা-ই নয়, বাস্তবেও খুব সুফল পাওয়া যায় না। আসলে সাধু বাঙলা মানেই কঠিন এবং সর্বসাধারণের অগম্য--- এই ধারণাটাই একপেশে। বাঙলা সাধু গদ্যে যে ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার পাওয়া যায়, তা পূর্ববঙ্গের মানুষ প্রতিদিনের জীবনে মুখের ভাষাতেই ব্যবহার করেন। তৎসম শব্দের ব্যবহার গ্রামের মানুষ করেন না, ব া তার অর্থ বোঝেন না--- এ ধারণাটাও ঠিক নয়। আজ থেকে আশি বছর আগে 'ভাষাতত্ত্ব ও বাংলাভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯২৩) বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। ভৃত্যের মুখে 'সামর্থ্য' শব্দটির উচচারণ শুনে একটু বিস্মিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তলিয়ে ভেবে বুঝেছিলেন, 'কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার ম াপে।' (দ্র 'বাংলাভাষা - পরিচয়, পৃ-'') আমাদের সামান্য গ্রামে - গঞ্জে ঘোরার অভিজ্ঞতাও এর সঙ্গে মিলে যায়। ফলতা অঞ্চলে এক বৃদ্ধার মুখে ভুলে যাওয়া বা বিস্মরণ অর্থে আমি শুনেছিলাম 'পাশরণ' আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল 'মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সেকথা যে যাই পাশরি'। আমাদের বাড়ির সামনে বসে জুতো সেলাই করেন যে-ম ানুষটি, তিনি রবিদাসপন্থী। আমাকে একদিন তিনি সন্ত রবিদাসের জীবনকথা শোনান এবং তাঁর জন্মকাল উল্লেখ করতে গিয়ে স্পষ্ট উচচারণ করেন 'সংবৎ'।

'সমভিব্যাহার', 'সমীপবর্তী' ইত্যাদি শব্দ নিশ্চয়ই নিচু ক্লাসের পাঠ্যবইয়ে থাকা উচিত নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শ াস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখের সারা বাঙলায় লেখা রচনার অংশবিশেষ সংকলন করলে তা ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট বরং তারা পায় 'বর্ণপরিচয়' পাঠ করতে গিয়ে। অন্যদিকে চলিত বাঙলাও যে সব সময় তাদের বোধগম্য হয়, এমনও নয়। 'সহজপাঠের' ভাষাও শিশুদের কাছে কতটা কঠিন এবং দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, বস্তি অঞ্চলে পড়াতে গিয়ে তা বারবারই টের পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের অনুপম গদ্যরীতিটা ধরতে পারাই আসলে খুব সহজ নয়--- তার জন্য একটা দীর্ঘ পরিচয় এবং চর্চার প্রয়োজন হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে আমি একটি চীনা মেয়েকে বাংলা পড়াতাম। ঐচ্ছিক বাঙলায় তাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেছিল রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের কয়েকটি

গল্প এবং ‘ছেলেবেলা’। অভিজ্ঞতায় দেখেছি ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পের ভাষা সে দিব্যি বুঝতে পারছে, কিন্তু ‘ছেলেবেলা’-র গদ্যরীতির ধাঁচটা সে কিছুতেই ধরতে পারছে না।

সাধু -চলিতের দ্বৈত নিয়ে এরকম আরও অনেক প্রশ্ন আছে। সেগুলি বিবেচেনা না করে সাধু গদ্যকে চলিতে রূপান্তরের নির্দেশ দিয়ে শিক্ষাপর্ষদ যে কাজটা করলেন, তা এক কথায় কাণ্ডজ্ঞানহীন। এবং সেখানেও শেষ পর্যন্ত তাদের নত হতে হলো। ৩১মে একটি সভার পর ঘোষণা করা হলো ওই নির্দেশ আপাতত স্থগিত থাকছে। ষষ্ঠশ্রেণীর যে বই ইতিমধ্যেই ছাপা হয়ে গেছে, সেখানে রূপান্তরিত গদ্যের ওই রচনাগুলি সিলেবাসে রাখা হবে না। এইভাবে কোন রকমে অবস্থাটা সামাল দেওয়া হলো; কিন্তু যে- দৃষ্টান্তটা রয়ে গেল, তা পর্ষদের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। পর্ষদের যোগ্যতা নিয়েই আমরা এখন সংগত কারণে প্রশ্ন তুলতে পারি; কারণ এ রকম কাণ্ড পর্ষদ আগেও করেছেন।

‘চিনা’ লিখছি না। বাংলা-র বদলে ‘বাঙলা’ লেখারই আমি পক্ষপাতী।

নবম শ্রেণির ‘লার্নিং ইংলিশ’ -এর প্রথম সংস্করণের প্রথম পাঠটির বিষয় ছিল যক্ষ্মারোগের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা। কার মস্তিষ্ক থেকে এই পাঠ্য বিষয়টি উৎপন্ন বয়েছিল জানি না; তবে কাগজে কিছু লেখালেখি হবার পরপর্ষদের কাছ থেকে নির্দেশ আসে ওই অংশটি পড়াতে হবে না। শিক্ষাপর্ষদই যদি এরকম খামখেয়ালে চলেন, তাহলে রাজ্যের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেই বা কী ধারণা হয়!

মন্ত্রিমহোদয়, আমলাবর্গ বা রাজনৈতিক নেতারা অনাহারজনিত মৃত্যুকে চলিতে রূপান্তর করে বলে দিতেই পারেন ‘রোগেভুগে মরা’। পরিণত পাঠক যা বোঝার বুঝে নেবেন। কিন্তু শিশুদের পাঠ্যবইয়ে এরকম ছেলেখেলা মানায় কি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com